হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১০ আগস্ট ২০১৭ ॥ ২৬ শ্রাবণ ১৪২৪ ॥ ১৭ জিলকদ ১৪৩৮ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

পিতা করে পুত্র জবাই এমন প্রেমের তুলনা নাই

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ইসলাম ধর্মের অন্যতম বিধান হলো কোরবানি। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা প্রতি বছর পশু কোরবানি করে থাকি। পবিত্র কোরআনের সূরা ছাফফাতে মহান আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর প্রিয়পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ঐতিহাসিক ঘটনা এভাবেই উল্লেখ করেছেন– 'অতঃপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহীম তাকে বললো, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাকে জবেহ করার জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহীম, আপনি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। আমি এভাবেই সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু' (সূরা ছাফফাত, আয়াত ১০২-১০৭)। হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে কোরবানির ফজিলত সম্বলিত বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, 'রাসুল (সঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান কোরবানির দিন যত নেক আমল করে, তার মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, পশু কোরবানির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা। কিয়ামতের দিন কোরবানির পশু (জীবিত হয়ে) তার শিং, খুর এবং পশম সহকারে উঠবে। কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে গড়ানোর আগেই আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থবান থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করলো না, সে যেন ঈদগাহের কাছেও না আসে' (ইবনে মাজাহ)।

কোরবানির মূল ঘটনা থেকে এখানে সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করা হলো : যখন বাবা হযরত আদম ও মা হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন মা হাওয়া (আঃ)-এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া ২-এর পাতায় দেখুন

নামাজে হুজুরি ও অন্তরে আল্লাহর এশ্‌ক-মহব্বত সৃষ্টি না হলে এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি

সহিহ্ হাদিস শরীফে আছে– 'লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরিল ক্বাল্‌বি'। অর্থাৎ : হুজুরি দিল ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, যে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিৎ সে যেন নেককাজ করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

যেমন, 'ফামান কানা ইয়ারজু লি-ক্বয়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সলেহান অলা ইউস্‌রেক বি-ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদান'।

বর্তমানে নামাজিদের নামাজের কী অবস্থা, তা একটু চিন্তা করে দেখুন। নামাজি ব্যক্তি বলেন, নামাজে (আলহামদু) ইয়াকা-না বুদু-ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন'। অর্থাৎ : আমি তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াত যখন পাঠ করা হয়, তখন কার কথা বা রূপ ওই নামাজি ব্যক্তির ধ্যানে থাকে? প্রায়ই দেখা যায়, যে যা ভালোবাসে বা যার ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে, তার কথাই ২-এর পাতায় দেখুন

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

আলহাজ মোঃ জয়নাল আবেদীন আল মোজাদ্দেদি

হযরত মুসা (আঃ)-এর জামানার একটি সত্য কাহিনী মাসিক আত্মার আলো'র পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। একদিন হযরত মুসা (আঃ)-এর এক উম্মত নবীর কাছে বললেন, হুজুর আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে চাই। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, তুমি আমার সাথে সফরে থাকতে পারবে না। পুনরায় আবার আর্জি করলেন, হুজুর, আমি থাকতে পারবো আপনি দয়া করে আপনার সাথে আমাকে নিয়ে যান। লোকটির অনুনয়-বিনয় দেখে হযরত মুসা (আঃ)-এর দয়া হলো এবং বললেন, ঠিক আছে চল। তারপর হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রয়োজনীয় মালামাল একটি গাট্টির ভিতর ভরে সফরসঙ্গীকে বললেন, এই লও আমার গাঠুরি নিয়ে এবার চলো। হযরত মুসা নবী (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী পথ চলা শুরু করলেন। চলতে চলতে অনেক দূর গেলেন। তারপর হযরত মুসা (আঃ) বললেন, অনেক দূর এসেছি কিছু আহার করে নেই। আমার গাট্টির ভিতরে রুটি আছে বের করো দুজনে মিলে খেয়ে নেই। গাট্টি খোলার পর দেখলেন ২-এর পাতায় দেখুন

আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে

ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ হওয়ার দলিল

আলহাজ মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরজ? উত্তরে হযরত বলেছেন, হ্যাঁ, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরয। যেহেতু আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, 'ইত্তা কুল্লাহা হাক্‌কা তুক্বাতিহি' তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর। যার পারিভাষিক অন্য নাম তাসাউফ। এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্য দিয়ে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অবশ্য এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামগণ অক্ষমতার আবেদন করায় অন্য আয়াত 'ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম' নাযিল হওয়ায় অনেকে একে নাসেক বলে গণ্য করে, আগের নির্দেশরহিত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা থানভী (রহ.) বলেছেন যে, তাফসীরের পারিভাষিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে রহিত হওয়ার বিষয় পরিষ্কার হয় না। বরং আমার গবেষণায় এখানে পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে আগের আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখা করা হয়েছে। কারণ, এর আগের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছিল তাৎক্ষণিকভাবে আয়াতের বর্ণিত হুকুম অনুযায়ী আমল করা ফরজ। যা সাহাবায়ে কেরামগণ কঠিন মনে করেছিলেন। অতঃপর আয়াতের তাফসির হিসাবে আল্লাহতায়ালা 'ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম' আয়াত নাযিল করে সাহাবাদের সংশয় দূর করে দেন।

সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা লেখার কলেবর একটু বড় দেখে পড়া থেকে এরিয়ে যাবেন না। একটু ধৈর্য নিয়ে যেকোন বিষয়ের শেষ পর্যন্ত না গেলে তার মর্ম বা স্বাদ আস্বাদন করা কখনোই সম্ভব হয় না। কারণ, সব ভালো তার শেষ ভালো যার। অতএব সবসময় সব ভালো অল্প কথায় শেষ করা যায় না। তাই এ নিবন্ধটি শেষ পর্যন্ত পড়ার আমন্ত্রণ করছি। বাংলা ভাষায় বহুল প্রচারিত প্রবাদ, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' ইসলামী আধ্যাত্মবাদের ভাষায় সৎসঙ্গ অর্থ্যাৎ, কামেলপীর বা মুর্শিদের সোহবত বা সঙ্গলাভই হলো সৎসঙ্গ। আমরা কি সব সময় সব কাজে এই সৎ সঙ্গের গুরুত্ব মেনে চলি? বা চলতে পারছি? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের কাছেই আছে। কেবল নিজেরাই জানি যে, কে কখন কার বা কোন ধরণের সঙ্গ নিচ্ছি? সে সঙ্গ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সৎ আর কতটুকু অসৎ? আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। সবাই জানি, মন্দ কাজের ফলাফল মন্দ। ভালো কাজের ফলাফল ভালো। তাহলে আমরা সারাদিনে কিংবা সারাজীবনে কতটুকু ভালো, আর কতটুকু মন্দ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি? দিন শেষে হিসেব করলেই ফলাফল পেয়ে যাবো। আমরা না জেনেও অনেক মন্দ কাজ করে থাকি। যখন বুঝতে পারি যে, এটি ভালো কাজ নয়, তবু অনুতপ্ত হই! যার অন্তর মন্দ কাজের প্রতি নিবিষ্ট সে সহজে অনুতপ্ত হতেও পারি না।

জীবনের তাড়নায় চারিদিকে এত অসৎ মানুষ, আর তাদের অসৎ কাজকর্ম দেখে দেখে অবলীলায় সৎ মানুষের সঙ্গ এরিয়ে চলা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ অভ্যাস যে কত ক্ষতির তা যদি তাৎক্ষণিক বুঝতে পারতাম, তবে অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাব ভুলে আত্মিক উন্নতির কথা ভেবে সৎ ও সত্যবাদি মানুষের সঙ্গলাভ করতাম। কিন্তু আমরা সাধারণ, বেহুঁশ-বেকারার সংসারের জ্বালায় ক্ষণকালীন দুনিয়ার মোহে অগণিত কালের আখেরাতকে ভুলে থাকি! যা বান্দার কাজ হতে পারে না। যে পরপারে সময়ের সীমা পরিসীমা নেই, সেখানে বসবাসের জন্য যে পুঁজির দরকার, সে পুঁজি এখান থেকেই কামাই করে নিয়ে যেতে হবে। অর্থ্যাৎ এখান থেকেই আল্লাহতায়ালাকে দেখে চিনে যেতে হবে। এখানে সাময়িক অর্থাভাবে পড়লে কারো কাছে ধার-দেনা নিয়ে চলা যায়, কিন্তু আখেরাতে ধার-দেনার সুযোগ নেই। সেখানে গর্ভধারণী মা চিনবেন না প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে। সন্তান চিনবেন না পরম মমতাময়ী মাকে। এ যে কী পরিমাণ পরিতাপের তা একবার চিন্তা করলেও ভয়ে মাথা ঝিম ধরে আসে। এ নিবন্ধে যে সৎ মানুষের সঙ্গলাভের আলোচনা করছি, তিনি হবেন একজন সত্যবাদি আল্লাহওয়ালা মানুষ। যে মানুষের আপন গুণাবলীর প্রভাবে, আমাদের মতো সাধারণেরা খারাপ অভ্যাস বা স্বভাব ত্যাগ করে ভালো মানুষে পরিণত হয়। যেমন পরশ পাথরের ছোঁয়া পেলে জংধরা লোহা খাঁটি সোনা হয়। মন্দ মানুষের অন্তর থাকে দুনিয়াবী চিন্তায় কলুষিত, সেখানে সু-অনুভূতি প্রবেশ করতে পারে না। শুধু দুনিয়ার চিন্তা গ্রাস করে বসে, পরপারের জন্য অন্তরে কোন অনুভূতিই হয় না। অনুভূতিশূন্য মানুষ পশুর সমান। এ দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এ দুনিয়াই দোজখ। চিন্তা আর অনুভূতি প্রকাশ একসঙ্গে হয় না, দুশ্চিন্তা দূর করলেই ৩-এর পাতায় দেখুন

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আত্মার আলো

পিতা করে পুত্র জবাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জোড়া (যমজ) অর্থাৎ একসঙ্গে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতেন। কেবল হযরত শীস (আঃ) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া হযরত আদম (আঃ)-এর আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহতায়ালা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে হযরত আদম (আঃ)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় হযরত আদম (আঃ) একটি জোড়ার মেয়ের সঙ্গে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিতেন। ঘটনাক্রমে কাবিলের সঙ্গে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। তাঁর নাম আকলিমা। কিন্তু হাবিলের সঙ্গে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে অতটা সুন্দরী ছিলেন না। তার নাম ছিল লিওজা। বিবাহের সময় হলে শরয়ী নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহোদরা বোন কাবিলের ভাগে পড়ল। কিন্তু কাবিল সে নিয়ম না মেনে তাঁর সহোদরা সুন্দরী আকলিমাকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কাবিলকে তাঁর নির্দেশ মানতে বললেন। কিন্তু সে তা মানল না। এবার তিনি কাবিলকে বকাঝকা করলেন। তবুও কাবিল ঐ বকাঝকায় কান দিলেন না। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) তাঁর এ দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি পেশ কর, যার কোরবানি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে, তার সঙ্গেই আকলিমার বিয়ে দেয়া হবে। সে সময় কোরবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কোরবানিকে ভস্মীভূত করে ফেলত। আর যার কোরবানি কবুল হতো না তারটা পড়ে থাকত। যা-হোক, তাদের কোরবানির পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, কাবিল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভালো ভালো গমের শীষ বের করে নিয়ে বাজে শীষগুলোর একটি আটি কোরবানির জন্য পেশ করল। আর হাবিল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্যে থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কোরবানির জন্য পেশ করল। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কোরবানিটি ভস্মীভূত করে দিল। আর কাবিলের

> আল্লাহর আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কাবিলকে তাঁর নির্দেশ মানতে বললেন। কিন্তু সে তা মানল না। এবার তিনি কাবিলকে বকাঝকা করলেন। তবুও কাবিল ঐ বকাঝকায় কান দিলেন না। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) তাঁর এ দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি পেশ কর, যার কোরবানি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে, তার সঙ্গেই আকলিমার বিয়ে দেয়া হবে।

কোরবানি যথাস্থানেই পড়ে থাকল। অর্থাৎ হাবিলের কোরবানিটি গৃহীত হলো আর কাবিলেরটি হলো না। কিন্তু কাবিল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করলো, তিনি (আল্লাহ) মুত্তাক্বীর কর্মই গ্রহণ করেন। এ বাক্যে কাবিলের প্রতি হাবিলের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। (তাফসীর ইবনু কাসীর, দুররে মনসূর, ফতহুল বায়ান, ৩/৪৫ ও ফতহুল ক্বাদীর, ২/২৮-২৯)।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হাবিল ও কাবিল কর্তৃক কোরবানির এ ঘটনা থেকেই মূলত কোরবানির ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের ওপরেই এ বিধান জারি ছিল। আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন জ্ব'আল্না– মানসাকাল লিইয়াযকুরুস্ মাল্ লা-হি আলা- মা- রাযকাহুম মিম বাহীমাতিল আন্ আ-মি; ফাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন ফালাহূ- আসলিমূ ওয়া বাশ্শিরিল মুখ্বিতীন।'

অর্থ: আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কোরবানির বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা রিযিকস্বরূপ উক্ত চতুষ্পদ পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে। এ জন্য যে, তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ, তাই তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক' (সূরা হজ, পারা-২২, আয়াত-৩৪)। ফতহুল ক্বাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবিলের পেশকৃত দুম্বাটি জান্নাতে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে। অবশেষে ঐ দুম্বাটি কোরবানির জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে প্রচলিত কোরবানির প্রথার উল্লেখ করে মিসরের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী 'দায়েরাতুল মাআরিফ' গ্রন্থে প্রমাণ সহকারে উল্লেখ করেছেন– 'হযরত নূহ (আঃ) জন্তু জবেহ করার উদ্দেশ্যে একটি কোরবানগাহ (কোরবানি করার নির্দিষ্ট স্থান) নির্মাণ করেছিলেন। এবং তাতে জবেহকৃত জন্তু আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিতেন। তারপর দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন কোরবানি পেশ করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সময় থেকেই কোরবানি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে প্রচলিত হতে থাকে।' তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কোরবানিই মহান আল্লাহর দরবারে ইবাদতে কবুল ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সেই কোরবানির মাধ্যমে নজিরবিহীন ত্যাগ দুনিয়ার বুকে কায়েম রাখার জন্য, সামর্থবানদের ওপর কোরবানি ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং হাদিস শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– 'হে আল্লাহর বান্দারা! অন্তরের খুশির সঙ্গে তোমরা কোরবানি কর' (তিরমিজি' ইবনে মাজাহ)। অপর হাদিসে কোরবানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবি হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একদিন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই কোরবানি কী? রাসুল (সঃ) উত্তরে বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসুল (সঃ) এতে আমাদের জন্য কী রয়েছে? রাসুল (সঃ) বললেন, কোরবানির পশুর প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকি রহিয়াছে।' সম্মানিত পাঠক ও প্রিয় আশেকান-জাকেরানগণ কোরবানির এত ফজিলত, যা লিখে শেষ করা যাবে না। কোরবানির গোস্ত খাওয়া ও এর হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলামানদের জন্য কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কোরবানির অসংখ্য ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে। একদিন নবী করিম (সঃ) তাঁর কন্যা মা ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন– ' ফাতেমা, তুমি তোমার কোরবানির পশুর নিকট যাও। কেননা কোরবানির পশু জবাই করার পর রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তখন মা ফাতেমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন– 'হে আল্লাহর রাসুল, এটা কি শুধু আমার জন্য? জবাবে রাসুল (সঃ) বললেন, সকল মুসলমাননের জন্য।' নবী (সঃ) আরো বলেছেন– 'আল্লাহর নিকট সব থেকে উত্তম আমল হলো কোরবানি করা। অতএব মুসলমানদের অবশ্যই কর্তব্য, মনের মধ্যে বিরাজমান যে পশুরশক্তি, ক্রোধ, লোভ, লালসা, হিংসা, পরনিন্দা এসব দূর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, আত্মত্যাগের মহিমায় নিজেকে উৎসর্গ করা।

নামাজে হুজুরি ও অন্তরে আল্লাহর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তখন তার ধ্যানে আসে। অথচ অন্য সময় অপেক্ষা নামাজের মধ্যেই নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও বাজে-বাহুল্য বিষয় হৃদয়ের ভিতর আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন এক কবি বলেছেন–

'জাবা দর জেকরে, ওয়া দের দর ফেকরে খানা,
চে হাসেল শোদ-জী নামাজে পাঞ্জেগানা।
চে শোদ গার মসহা-ফাহ দর পেশে বাশোদ
চু দেল দর ফেকের গাওউ মেশে বাশোদ।'

> স্মরণ করতে হবে না। বরং এ কথার মর্মে বোঝা যায় যে, নামাজের সব অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওজরবশত তাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। এটা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়েছেন

অর্থাৎ : মুখে আল্লাহর জিকির ও মনে বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকলে, সে রকম পাঞ্জেগানা নামাজে তোমার কী ফল হবে? তোমার মনে যদি গরু ও মেষের ভাবনা থাকে, তবে সামনে কোরআন খুলে রাখলে কী ফল হবে?

অতএব, খোদার এবাদতে ঘোড়া, গরু, ভেড়া-বকরী, স্ত্রী-পুত্রকে গায়রুল্লাহ ভেবে আমরা বাতেনে মোশরেক হচ্ছি। এ যে কত বড় ভয়ঙ্কর ও পাপের কাজ করে চলেছি আমরা, তা বুঝতে পারছি না। এ ধরনের শেরক থেকে মুক্তির চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধ আত্মায় কবুলিয়াতের নামাজ আদায় করা প্রতিটি ঈমানি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য নয় কি? রাসুল (স:) সাহাবিদের, যে নামাজ শিক্ষা দিতেন, সে নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয় না। কিন্তু আমরা সে বিষয়ের বা পদ্ধতির কতটুকু মেনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি?

'ইন্নাল-লাহা লা-ইয়াগফির আন ইউস্‌রিকা বিহী ওয়া ইয়াগফির মাদূনা জালিকা লি-মাইয়াশা'।

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁর সঙ্গে শেরককারীকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন– 'আনতাবুদাল্লাহা কা-আন নাকা তারাহু ফাইল্লাম তাকূন তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাকা'।

অর্থাৎ, তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তা না পার, তবে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এই হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নামাজেই আল্লাহর মোশাহেদা (দর্শন) করতে হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে অন্য এক হাদিস শরীফে রেওয়ায়েত আছে– 'ইন্নাল মোকমিনূনা ইজা-কানা ফিস্ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউসাব্বি রাব্বাহু।'

অর্থাৎ, নিশ্চয় মমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তার পালনকর্তার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে রায় দিয়েছেন– নামাজের প্রথম তাকবিরের সময় আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ হলেই নামাজ হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, নামাজের অন্য অংশে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করতে হবে না। বরং এ কথার মর্মে বোঝা যায় যে, নামাজের সব অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওজরবশত তাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। এটা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়েছেন। তাই বলে, তিনি এটা বলেননি যে, তোমরা জীবনভর ওইভাবে নামাজ পড়ো।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্ ২০৮ নাম্বার আয়াতে আছে– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ খুলু ফিসসিলমি কা-ফ্ফাহ, অলা-তাত্তাবিউ খুতু ওয়াতিশ শাইত্বোয়ান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন।'

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের (কুমন্ত্রণাদানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

লোভে পাপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রুটি হালুয়া কিছুই নেই। এবার আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, হালুয়া রুটি কোথায়? সঙ্গী উত্তর করলেন আমি বলতে পারবো না। হযরত মুসা (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রুটি খেয়েছ? এবারও সঙ্গী বললেন, 'না। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, তাহলে রুটি কে খেয়েছে? সঙ্গী বললেন, হুজুর আমি বলতে পারবো না। অতঃপর মুসা (আঃ) বললেন চলো আল্লাহই ভালো জানেন। পনরায় আবার পথ চলা শুরু করলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলেন, পথে একটা স্বর্ণের টুকরো পড়ে আছে, মুসা (আঃ) উঠিয়ে তা হাতে নিলেন। এরপর সঙ্গীকে বললেন, বসো আর স্বর্ণের টুকরোকে তিনটি টুকরো করো। সফর সঙ্গী বললেন, হুজুর আমরা লোক মাত্র দুইজন স্বর্ণটাকে তিন টুকরো কেনো করতেছেন? হযরত মুসা নবী উত্তর দিলেন, মানুষ আমরা তিনজন। সঙ্গী বললেন,

'না হুজুর, আপনি আর আমি মাত্র দুইজন। এবার হযরত মুসা নবী বললেন, 'না, তিনজন, সঙ্গী বললেন, কেমনে তিন জন? হযরত মুসা (আঃ) বললেন ১. আমি ২. তুমি আর ৩. যিনি রুটি খেয়েছে, এই মোট তিন জন এবার বুঝতে পেরেছ? উত্তরে সঙ্গী বললেন, হ্যাঁ। মুসাফির বললেন, হুজুর যদি মনে কিছু না করেন আমি একটা সত্য কথা বলবো? হযরত মুসা (আঃ) বললেন, 'বল। সঙ্গী বললেন, হুজুর রুটিগুলো আমিই খেয়েছি। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, তাহলে তোমার দুইটা আমার একটা মোট তিনটা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার তুমি চলে যাও। মুসাফির চলে গেলে বেশকিছু দূর যাওয়ার পর দুইজন পথিকের সঙ্গে দেখা হলো। পথিকরা জানতে চাইলো, এই তোমার ঝুলির ভিতর কী? মুসাফির বললো, কিছু না। তারা বললো, নিকটে আসো দেখি কি আছে তোমার ঝুলির ভিতর? খুলে দেখা গেল তিনটা স্বর্ণের টুকরা। পথিক দুইজন বললো, আচ্ছা বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো, আমরা তিনজন খেয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবো। তারপর মুসাফির বাধ্য হয়ে বাজারে গেলেন। এবার মুসাফির চিন্তায় পড়ে গেলেন তারা হলো দুইজন আমি একা, তাদের থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়? এই চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলেন যে, আমি আমার খাবার খেয়ে নেই, আর ওদেও খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিয়ে যাই। ওরা দুইজন চিন্তা করলো, ওকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে তিনটি স্বর্ণের টুকরার মালিক আমরা দুইজন হয়ে যাব। এই চিন্তা করে তারা সিদ্ধান্ত করলো মুসাফিরকে হত্যা করবে। বাজার থেকে ফিওে আসার পর তাকে বললেন, এত দেরি হলো কেন? এই কথা বলতে বলতে মুসাফিরকে মারতে মারতে একেবারে মেরেই ফেললেন। এবার পথিক দুইজন বললো, চলো এবার খেয়ে নেই তারপর অন্য কাজ। বিষ মিশ্রিত খাবার খাওয়ার পর তারা দুইজনও সেখানে মরে পড়ে রইলো। এবার হযরত মুসা (আঃ) কে আল্লাহ হুকুম করলেন, হে মুসা, তুমি আবার এই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। তখন হযরত মুসা (আঃ) বাড়ি ফিরতে শুরু করলেন। পথের মধ্যে এসে দেখেন তাঁর সেই সঙ্গীসহ আরো দুইজনের লাশ পড়ে আছে। আর ঐ স্বর্ণের টুকরো তিনটিও পড়ে আছে। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহপাকের নিকট এ ঘটনার সব কথা জানতে চাইলেন। আল্লাহপাক বর্ণনা করে শুনালেন। তারপর আল্লাহপাক হযরত মুসা (আঃ) কে বললেন, 'হে মুসা, মনে রেখো, দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ায় পড়ে থাকবে, মানুষ কিন্তু থাকবে না, যেমন স্বর্ণের টুকরোগুলো পড়ে আছে, কিন্তু মানুষগুলো মরে জগৎ ছেড়ে চলে গেল। তাই বলা হয় যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এই শিক্ষাই আমার পীর খাজাবাবা কুতুববাগী দিয়ে থাকেন। আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত করুন, আমিন।

> চিন্তা করে তারা সিদ্ধান্ত করলো মুসাফিরকে হত্যা করবে। বাজার থেকে ফিওে আসার পর তাকে বললেন, এত দেরি হলো কেন? এই কথা বলতে বলতে মুসাফিরকে মারতে মারতে একেবারে মেরেই ফেললেন। এবার পথিক দুইজন বললো, চলো এবার খেয়ে নেই তারপর অন্য কাজ

পবিত্র ঈদুল আযহার শিক্ষা

সাইফুল ইসলাম দীপক

সকল বিষয়েরই আছে দুটি দিক। একটা বাহ্যিক, আরেকটা অন্তর্নিহিত। অথচ আজকাল আমরা সব কিছুর বাহ্যিক দিকটা নিয়েই বেশি ব্যস্ত। কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে চাই না। ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ বলতে আমরা শুধু বুঝি, পশু কোরবানি করা আর তা বিতরণ করা এবং নিজে খাওয়া। কিন্তু আমরা খুব কম সময়ই অন্তর্নিহিত অর্থটা নিয়ে ভাবি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহপাকের নির্দেশে তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কোরবানি করেন। ইসলামের অত্যন্ত তাৎপর্যময় ঘটনা এটি। আল্লাহপাক হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই ত্যাগে খুশি হয়ে তাঁর সন্তানের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি করান। এই অভুতপূর্ব ঘটনার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমাই শিক্ষা দেন আল্লাহপাক। ত্যাগের মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। আর যে আল্লাহকে পেয়েছেন, দুনিয়ার এই জগৎ তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। কিন্তু আমরা দুনিয়ার জগৎকে পেতেই বেশি আগ্রহী, আল্লাহকে পাওয়ার ইচ্ছা আমাদের অন্তরে নাই বললেই চলে! আর তাই ত্যাগের শিক্ষাও আমাদের মধ্য থেকে যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। কেবল আছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা। এই অতি ভোগের আকাঙ্ক্ষাই আমাদেরকে পশু বানিয়ে দিচ্ছে, আর সে কারণেই দুনিয়াতে জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, কষ্ট লেগেই আছে। খুব কম সংখ্যক মানুষই অল্পতে তুষ্ট থাকতে পারি বলে আমার মনে হয়। যার যত আছে, তাঁর তত বেশি চাই। এই চাওয়া পুরণ করতে গিয়ে আমরা সব ভুলে উন্মত্ত হয়ে গেছি। অন্তরে এক হিংস্র পশু যেন সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে। মানুষ খালি ছুটছে। কোনো স্থীরতা নাই মানুষের মধ্যে। তাই কোন শান্তিও নাই। অর্থকে মানুষ শান্তি মনে করছে। আর সেই অর্থ নামক শান্তিকে পেতে গিয়ে আরো অশান্তির মধ্যে পড়ছি। তবু আমাদের ভ্রুক্ষেপ হয় না। আমিও যে এর ব্যতিক্রম তা বলছি না। কিন্তু আজকে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি কিছু হলেও অন্তরে পরিবর্তন এসেছে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা কমে যাচ্ছে। কিছুটা হলেও আল্লাহকে পাওয়ার আকুতি অন্তরে তৈরি হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে আমার মুর্শিদ কেবলার শিক্ষার কল্যাণে। এই শিক্ষা সবাই দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর কামেল অলিগণ দিতে পারেন। তার কারণ মুখে মুখে জ্ঞানের কথা বলেন অনেক তথাকথিত জ্ঞানী। কিন্তু সত্যিকারের ত্যাগী মানুষ কেমন হয় তা আমার মুর্শিদ কেবলাকে না দেখলে বুঝতাম না। এখন বুঝতে পারি, যিনি আল্লাহকে পেয়েছেন তাঁর মধ্যে দুনিয়াবী কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। দুনিয়া করেন বটে, কিন্তু তাতে তিনি আসক্ত নন। তাই আল্লাহপাক কোরআন শরীফে সুরা ইউনুসে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার অলিগণের কোনো ভয় নাই, এবং তাঁরা কখনো চিন্তিতও হবেন না'। হবেনই বা কেনো? যিনি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত নন তাঁর দুনিয়ার প্রতি ভয় থাকার কথাও নয়। আমাদের এত ভয়ের কারণ, আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। আর দুনিয়াবী বস্তু হারিয়ে যাবার ভয় আমাদের সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরে। অথচ আজ বা কাল এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হবে। কিন্তু তাঁর পরেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে না! আজকাল এই বিষয়গুলো বেশি বেশি মনে হয়। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, আমি তো এরকম ছিলাম না। আমারও তো অর্থ, সম্পদ, নাম, যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদিও প্রতি অনেক আকর্ষণ ছিল। আজ কেন এসব অর্থহীন মনে হয়! আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এ কথাই কেন বেশি বেশি চিন্তা হয়। অনেকে ভাবতে পারেন, বয়স হচ্ছে হয়তো এই কারণে মৃত্যু চিন্তা আসছে। আমি অনেক মানুষ দেখেছি, অনেক বয়স হয়েছে কিন্তু দুনিয়ার চিন্তা তাঁদের ছাড়ে না। আসলে খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছে এসে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য তরিকার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং তাঁর দেখানো রাস্তায় চলার কারণে আমার এই পরিবর্তন। আমি শুধু একা নই আমার মত আরো অগনিত মানুষ খাজাবাবা কুতুববাগীর শিক্ষা মত চলে তাঁদের মধ্যেও এই পরিবর্তন গড়তে স্বক্ষম হচ্ছেন। যারা এখনও খাজাবাবার সান্নিধ্যে আসেননি অনেকে ভাবতে পারেন যে, আমি মুর্শিদের গুণগান তো করবোই। আমি অধম সেই যোগ্য নই। সত্যি যদি পারতাম এই মহামানবের গুণ বর্ণনা করতে, তাহলে আমার জীবন ধন্য হত। লেখার মাধ্যমে অতি সামান্য চেষ্টা করি মাত্র। সত্যি আল্লাহকে পেতে হলে ত্যাগী হতেই হবে। আর ত্যাগী হতে হলে একজন ত্যাগী মানুষের সঙ্গ করতে হবে। এর বিকল্প কিছু নাই। আরেকটা শিক্ষা দেন খাজাবাবা। তা হলো নিজের নফসের সাথে জিহাদ। নিজের ভিতরের পশুকে কোরবানি করার শিক্ষা। খাজাবাবা আরো বলেন, 'নিজের ভিতরের পশুটাকে বশ করেন। এখানেও একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করি আজকাল। আমার ভিতরে যে পশু আছে, তার চেহারা যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন বুঝতে পারছি আসলে এই পশুই বশ করার কথা বলেন আমার মুর্শিদ। এর মধ্যে আছে ষড়রিপু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। কোনো কোনো সাধক কবি এদেরকে ছয়টা বলদ বলেও উল্লেখ করেছেন। এরাই আমাদেরকে তাড়া করছে সব সময়। খাজাবাবার কাছে শুনেছি আরো শত রিপু আছে মানুষের মধ্যে। এই সব জয় করেই তবে আল্লাহর কাছে পৌঁছানো যাবে। রিপু নামক এই সব পশু বশ করতে হলে প্রথমে তাদের চিনতে হবে। আর চেনার জন্য একজন কামেল অলিআল্লাহর কাছে যেতে হবে, যার কাছে সেই বিশেষ জ্ঞান বা ইলমে লাদুন্না আছে। যেই জ্ঞান শুধু সিনায় সিনায় বিতরণ হয়, কোনো বই পুস্তকে পাওয়া যায় না। সেই জ্ঞান নিয়ে বসে আছেন খাজাবাবা কুতুববাগী আপনার আমার জন্য। এবং এর লক্ষ্য একটাই তা হলো, আল্লাহর পথ ভুলে থাকা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা। এই লেখা লিখতে লিখতেই মনে একটা নতুন শক্তি অনুভব করছি। নিজের ভিতরের পশুকে বশ করে ত্যাগের পথ অতিক্রম করে আল্লাহকে পেতে হবে। আল্লাহপাক আমাকে এবং সকলকে কবুল করুন, আমিন।

ভিতরের পশুকে কোরবানি করার শিক্ষা। খাজাবাবা আরো বলেন, 'নিজের ভিতরের পশুটাকে বশ করেন। এখানেও একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করি আজকাল। আমার ভিতরে যে পশু আছে, তার চেহারা যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন বুঝতে পারছি আসলে এই পশুই বশ করার কথা বলেন আমার মুর্শিদ। এর মধ্যে আছে ষড়রিপু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য

সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোরআন পড়তে জানেন তারা নিশ্চয়ই এ কথায় দ্বিমত করবেন না। প্রকৃতপক্ষে কালে কালে তাঁরাই সৎ ও খাঁটি আলোকিত মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গলাভ করতে পারলেই কেবল অন্তরে মন্দ কাজের প্রভাব বাসা বাঁধতে পারে না। এ নিবন্ধকারের মতো লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকেবলা বলেন, 'যাদের অন্তরে এক আল্লাহর প্রতি ভয় ও রাসুল (সঃ) এর প্রতি মহব্বত নাই, তারা কোনদিন আল্লাহর দেখা পাবে না।' আবার নাস্তিকেরা বলেন, যারা ইবাদত করে আর যারা ইবাদত করে না সবাই তো মরবে, তাহলে ইবাদত করে সময় নষ্ট করে কী হবে? নাউজুবিল্লাহ! আসলে ইবাদত করে যে ব্যক্তি মানুষ হয়েছেন কিংবা মানুষ হওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত করেন, সেই মানুষের কখনোই মৃত্যু হয় না। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে– 'কুল্লি নাফসীন জাইকাতুল মাউত।' অর্থ: প্রতিটি নফসকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' অতএব মানুষ মরে না, মরে তার 'নফস' ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়া-পাওয়া। পবিত্র কোরআনের কোথাও কি উল্লেখ আছে মানুষ মরে? এখানে জীব ও পরমের মধ্যে ব্যবধান যোজন যোজন। মানুষ রূপে জন্মালেই মানুষ হওয়া যায় না। জীবনে মানুষ হতে চাইলে, খাঁটি মানুষের সঙ্গ ছাড়া বিকল্প নাই। আর খাঁটি মানুষই হলেন পরমের সঙ্গে নিজের আত্মাকে বিলিন করে দেওয়া পবিত্র এক মহা-আত্মা, যে আত্মার মৃত্যু হয় না। শুধু জীবের মৃত্যু অবধারিত। আধ্যাত্মবাদের গুণী সাধকরাও তা-ই বলেছেন যেমন– 'মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।' এ কথার অর্থ দিন ছাড়া যেমন সূর্য দেখা যায় না, তেমনই মানুষ ছাড়া মানুষ চেনা-জানা যায় না। তাই মানুষ ছাড়াও মহান আল্লাহকে চেনা-জানার কোন পথ নাই। একটি গাছের শিকড়ই তার শক্তি শিকড়হীন গাছ তো গাছই না, সে মরা কাঠ বা লাকড়ি। তাই, একজন কামেলপীর হলেন সাধারণ মানুষের ভিতরের মানুষ বা মূলকে চেনার মাধ্যম। অতএব এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কামেল মানুষের সঙ্গ ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই। তিনিই পারেন আল্লাহকে পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে। মহান আল্লাহরই কৃপায় কঠোর রিয়াজত ও সাধনার মাধ্যমে তিনি জেনেছেন সেই পথের গন্তব্য।

সম্মানীত পাঠক, ইসলাম ধর্মের তরিকত ও মারেফত নিয়ে যারা কটাখ্য করেন, তাদের ব্যাপারে একটা উদাহরণ দিলে তারা সহজে বুঝতে পারবেন যেমন, আমরা চোখের সামনে যা কিছু দেখি, তার চেয়ে কতশত বেশি দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়, যা আমরা দেখতে পাই না! এখন কথা হলো, যা দেখা যায় না, তা গোপন বা মারেফত। হাদিস শরীফে আছে, 'তালাবুল ইলমি ফারীদাতুন আ'লা কুল্লি মুসলিমিঁউ ওয়া মুসলিমাতিন।' অর্থ: ইলম শিক্ষা নর-নারী উভয়ের জন্য ফরজ। ইলম দুইপ্রকার (এক) ইলমে শরিয়ত ও (দুই) ইলমে ফারেফত। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দুইপ্রকার ইলম অর্জন করা অবশ্যই প্রয়োজন। শরিয়তের ইলম দুনিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইলমে মারেফত শিখতে হলে কামেলপীর ধরা প্রয়োজন, যাঁর কাছে ইলমে শরিয়ত ও ফারেফত এ দুইপ্রকারের ইলম আছে। ইলম অর্থ জ্ঞান। একজন আধ্যাত্মিক সাধক আধ্যাত্মিকতার মহাজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান। তিনি সেই শক্তির মাধ্যমে বাতেন বা গোপন, অদেখা স্থান আর অজানা বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। এই দেখা আর জানার মাধ্যম হচ্ছে গোপন বা বাতেনী জ্ঞান। এ কথা বিশ্বাস না হলে কুতুববাগ দরবার শরীফে কুতুববাগী পীরকেবলাজানের কাছে একবার আসুন, এবং জেনে যান তাঁর অধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে। তিনি সাধারণকে এ জ্ঞান অর্জন করাতে এবং অজানাকে জানাতেও পারেন। তাই আল্লাহকে দেখা বা চেনার ইচ্ছা থাকলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত আর পণ্ডিতসহ সবাইকে আধ্যত্মবাদের চেতনায় শামিল হতে হয়। কারণ, কামেল পীরের কাছে বাইয়াত নিয়ে স্ব-স্ব কলবের সালিম করেই কেবল মুমিনের দরজা লাভ করতে হয়। ইয়াজিদী মতবাদী বাতিল পন্থার মৌলভীদের ফতোয়া শুধু আত্মঘাতীই নয়, সাধারণের জন্য চরম বিপদেরও। তাই, সচেতন পাঠকের কাছে যুক্তি ও সত্যতা যাচাইয়ের ভার দিয়ে এ লেখা শেষ করছি।

মানুষ এইসব কামেল মানুষের সঙ্গ নিয়েই স্বর্গশুধা লাভ করেছেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু । কিন্তু অনেক মানুষ পীর-মুর্শিদের সঙ্গ বা তাঁদের পবিত্র দরবার পছন্দ করেন না। তারা বলেন, 'পীরের দরবারে গেলে কী পাওয়া যায়? তাঁরা কি বেহেশত পাইয়ে দিবেন? তাঁরা নিজেরাই তো নিজেদের খবর জানেন না যে, তাঁরা কোথায় যাবেন বেহেশতে না দোজখে!

আপন শায়েখের সামনে থাকাই

শেষ পৃষ্ঠার পর

মত পাপীতাপী গুনাহগার নালায়েক নাফরমানদের হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহর হুকুমে কামেল গুরুরা আমাদের মাঝে আসেন। তো আমরা যদি এই বিষয়টি আমাদের জীবনের মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন স্বার্থক হবে, সফলতা নেমে আসবে জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে। তখন কোন কাজ বা বিষয়ই আর আপনার আমার কাছে তেমন একটা কঠিন বলে মনে হবে না। কারণ, আপনার মাথার উপরে যদি আপন গুরুর নজর বা হাত থাকে, তবে মনে রাখবনে দুনিয়ার কোন শক্তিই আপনাকে আর রুখতে পারবে না। তাই যতটা সম্ভব আপনি আমি ও আমরা আপন গুরুর সান্নিধ্যে বেশি বেশি আশার চেষ্টা করবো।

একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে! আমরা তরিকার মানুষেরা অনেক সময় বলে থাকি, আরে আমিতো আমার পীরকে চোখ বন্ধ করলেই পাই।

হাকিকতেই আমার পীর আমার সকল সমস্যা সমাধান করে দেন। এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু এটা কার জন্য, কোন স্তরের মুরিদের জন্য? এটা মনে হয় একমাত্র আপনপীরই ভালো জানেন। এ ধরণের কথা শুনলে অনেক সাধারণ মুরিদ-জাকের ভাইদের মন হালকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে আমি মনে করি। আমার কথা হচ্ছে আপন পীর আপনাকে দয়া করে ঐ স্তর দান করেছেন! তবে এটা আর সকল ভক্তের জন্য নাও হতে পারে। তাই সর্বসম্মতিক্রমে পীরকে সামনে থেকে দেখলে যতটা শান্তি ও ফয়েজ উপলদ্ধি করা যায়, দূর থেকে সবার পক্ষে তা সম্ভব কি? তাই সবচেয়ে সহজ ও সরল উপায় হচ্ছে সামনা সামনি পীরের থেকে ফয়েজ আহরণের চেষ্টা করা। সেই আমল বা জ্ঞানের তেজ বা ঝাজ যে কতোটা শক্তিশালী, তা একমাত্র যে বা যারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন তারাই বুঝবেন।

আমি আমার শায়েখের সামনে দাঁড়াবো এতেই তো মন-দুনিয়ার সকল তৃপ্তি লুকায়িত রয়েছে। যদি দয়া করে আপন শায়েখ আমার মতো গুনাহগারের দিকে তাঁর রহমতের দৃষ্টি একবার দেন, তবেই তো আমার সকল পাপমোচন হয়ে যায়। মনে হয় এইতো আবার নতুন করে জন্ম নিলাম। শুধু এটুকুই নয়, তিনি যদি অপরাধ ও অপকর্মে ভরা এই পচা শরীরকে তাঁর পবিত্র হাতে একটু ছুয়ে দেন, মনে হয় তখন থেকেই আমি বেহেস্তের কোন একটা অংশ হয়ে যাই। মাঝেমধ্যে পীর মুরিদের মধ্যে চোখা-চোখি হয়ে থাকে তখন মনে হয় সমস্ত শরীরটা একটা বরফের টুকরাতে পরিণত হয়ে যায়। তবে এটা যার যার ব্যক্তিগত অনুভূতি। আর এই রহমতগুলো তখনই হয়, যখন আমাদের আপন গুরু বা আপন মুর্শিদ বর্তমান জামানার মোজাদ্দিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে এসে থাকি। আমি এ লেখার মধ্যে যা কিছু লিখলাম বা বললাম সবই নগদ হিসেবের কথা। কথায় বলে বাকির নাম ফাঁকি। বাকি মানে সময় ক্ষেপণ আর কিছু তিক্ততা। জেনে-শুনে কেনো আমরা সময় ক্ষেপণ বা তিক্ততার মাধ্যম বেছে নিবো? তাই আসুন যতো বেশি বেশি সম্ভব আপন মুর্শিদের সান্নিধ্যে আসা-যাওয়া করবো। তাতে আমরা বেশি দয়া পাবো, দ্রুত নিস্পাপ হতে পারবো, দুনয়িা ও আখিরাতে উভয় দিকেই সাবলম্ভী হতে সক্ষম হবো। পরিশেষে আমার মুর্শিদগুরু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে আমি গুনাহগারসহ সকল পীরভাই ও পীরবোনেরা যেনো আরও বেশি বেশি গুরু দর্শন ও গুরু দক্ষিণা দিতে পারে সেই সাহায্য ও দোয়া চাই।

আপন শায়েখের সামনে থাকাই বড় নিয়ামত

এম এইচ মোবারক

আমরা যারা তরিকায় বিশ্বাস করি, এবং দৃঢ়তার সাথে এটাই মানি যে, তরিকার পথই হচ্ছে একমাত্র পথ যা দয়াল নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) দেখিয়েছেন। এই সত্য মতবাদে বিশ্বাসীগণের উদ্দেশ্যেই আমি কিছু বলতে চাচ্ছি।

আমি মনে করি যতোটা সম্ভব আপন পীর বা গুরুর সানিধ্যে আসা-যাওয়া করা যায় ততোই আমাদের জন্য মঙ্গল হবে। আমরা অনেক সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ কর্মের জন্য বা নিজেদের মধ্যে অলসতার বশে কিছু দিন বিরতি দিয়ে পীরের কদমে আসি। এ ক্ষেত্রে বলবো এতে করে আমাদের নসিব পিছিয়ে যায়। আমাদের আত্মা দুর্বল হয়ে পরে। এমনকি আমাদের ঈমানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যদি স্বয়ং পীর আমাদের মানসিক হাল ধরে না রাখেন। আমাদের মনের হলুদ রং-টা ঘোলাটে হয়ে যায়। যদি তাই হয় তবে এটা কি আমাদের জন্য ক্ষতিকারক নয়? আমরা গুরুর সান্নিধ্যে যত বেশি বেশি আসতে পারবো আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের পথ তত বেশি সুন্দর ও সুগম হবে বলে আমি মনে করি। কেননা পীরমু-র্শিদগণ চায় তাঁর অনুসারি বা ভক্তরা বেশি বেশি তাঁর সান্নিধ্যে আসুক এবং এপার-ওপারের সফলতা লাভ করুক। পীরভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন, একজন কামেল গুরুর আগমন কেনো হয়? কি কাজ করেন একজন কামেল মুর্শিদ? আপনার আমার ৩-এর পাতায় দেখুন

ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু!! ইয়া রাহীম!!! ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন!!!!

দাদা হুজুর শাহসূফী হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রহঃ) বেসালাত উপলক্ষে

কুতুববাগ দরবার শরীফের উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী ঈমান ও আমলের জরুরী বয়ান তালিমী শিক্ষার উদ্দেশে ফাতেহা ও জাকের ইজতেমা

২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রোজঃ বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার

স্থানঃ আহম্মদবাড়ী (সেনবাড়ী) কানিহাড়ী ইউনিয়ন ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

৩ দিনব্যাপী

এ দ্বীনি জলসায় আশেকান ধর্মপ্রাণ ভাই-বোনদের পর্দার সাথে থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শেষ দিনে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে নছিহতবাণী ও আখেরী দোয়া করবেন কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর কেবলাজান

৩ দিনব্যাপী এ দ্বীনি জলসায় আলোচনা করবেন

২১ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার

* সাইফুল ইসলাম আল্লামা মুফতি আবুল কালাম আজাদ
অধ্যক্ষ বাইতুল মোস্তফা আলিয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম
* আল্লামা খন্দকার মাহবুবুল হক
আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আরব-পারস্য সহ এশিয়া বহু রাষ্ট্র সফরকারী আলেমে দ্বীন প্রখ্যাত মোফাসসিরে কোরআন, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
* ভাষাবিদ মোফাসসিরে কোরআন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোবাল্লিক, তাসাউফ গবেষক
আল্লামা শহিদ উল্লাহ পাঠান আল-মোজাদ্দেদি
খতিব, কুতুববাগ দরবার শরীফ, সদর দপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা
* মাওঃ ক্বারী হাবিবুল্লাহ জিহাদী, ফরিদপুরী
* হযরত মাও. মুঞ্জুরুল ইসলাম আল হোসাইনী
বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন ভাষ্যকার, সোনারগাঁয়ী, নারায়ণগঞ্জ
* মোফাসসিরে কোরআন হযরত মাও. কুতুবুল আজিজ বুলবুলী
নাসির নগর, বি-বাড়িয়া
* মুফতি চঞ্চল আলম আজমী ফেকুয়া, কক্সবাজার
* মোফাসসিরে কোরআন হযরত মাও. আবদুল গাফফার
টেকনাফি, কক্সবাজার, (মাযহারুল উলুম দাওরায়ে হাদীস, চাহরামপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

২২ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার

* আলহাজ হাফেজ তোফাজ্জল হোসেন, ভৈরবী
* আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক,
আলহাজ মাও. তাজুল ইসলাম চাঁদপুরী
আলোচক বাংলা টেলিভিশন লন্ডন, খতিব- মদিনাবাগ কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদ, মুগদা, ঢাকা
* মুফতি গোলাম আম্বীয়া সিরাজগঞ্জী, লেখক ও বহু রাষ্ট্র সফরকারী, কুতুববাগ দরবার শরীফের মোজাদ্দেদিয়া ওলামা মিশনের, চেয়ারম্যান
* মমতাজুল মোহাদ্দিস আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা
আল্লামা শোয়েব উদ্দীন পাঠান আল-মোজাদ্দেদি
খতিব- লালকুঠি দরবার শরীফ, শুম্ভগঞ্জ, ময়মনসিংহ
* আলহাজ হযরত মাও. মুফতি মিজানুর রহমান মিজানী নওগাঁ
* মাওলানা মতিউর রহমান এছলাহী আল- মোজাদ্দেদি
বড়ধূলী, সিরাজগঞ্জ
* আলহাজ মাও. গাজী তামিম বিল্লাহ
আল-কাদরী, আলোচক বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, চ্যানেল আই, এনটিভি
* আলহাজ মাওঃ হাবিবুল্লাহ নূরী টংগী, ঢাকা
* হাফেজ ক্বারী মাও. তাজাম্মুল হক
পেশ ইমাম, কুতুববাগ দরবার শরীফ (সদর দপ্তর) ফার্মগেট, ঢাকা

আরো আলোচনা করবেন দরবার শরীফের ওলামায়ে ও বিশিষ্ট খাদেমগণ

সময়: বৃহস্পতিবার বাদ ফজর শুরু হয়ে শুক্রবার জুমার নামাজ বিশাল জামাতের মাধ্যমে রাতব্যাপী তরিকতের মহান শিক্ষা জিকির আজগার ও আলোচনা শেষে বাদ ফজর আখেরী মোনাজাত

৩দিনব্যাপী এ দ্বীনি জলসায় আপনারা দলে দলে শামিল হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি হাসিল করুন

নিবেদক : আহম্মদবাড়ী (সেনবাড়ী) এলাকার জাকেরবৃন্দ

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বাণী

৫টি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

- জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।
- হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।
- যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আকর্ষিত হওয়া।
- ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।
- সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ
(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা (৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং (৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

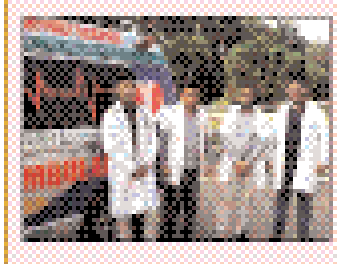

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+M Ambulance Service

ICU, CCU, NICU & PICU

লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, শালবাই ট্রিমিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।

বিঃদ্রঃ জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, অটোমিটার, সিলিন্ডার, নেবুলাইজার এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে

৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭

www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.